ভারতে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ

ড. অনিরুদ্ধ চৌধুরী

ভূমিকা

সামাজিক জীবনযাপনের পথে মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ও যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, প্রথম থেকেই সেসব মানুষকে সমাজ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই ভাবেই ধীরে ধীরে প্রথমে সমাজদর্শন পরে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান সমূহ এবং কালক্রমে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। সমাজ বিজ্ঞানী রেমণ্ড অ্যারোঁ-এর মতে, অগাষ্ট কোঁত ১৮৩৮ সালে সোসিওলজি নামের এক নতুন বিজ্ঞানের সূচনা করেন যা সমাজের ঐক্য ও উন্নয়নের সূচক। অ্যালান সুইংউড যেমন মনে করেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে প্রকৃত অর্থে কোনো শাস্ত্র হিসেবে সমাজতত্ত্ব-এর অস্তিত্ব ছিল না। অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত'র মত এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, সমাজচর্চার এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বর্তমানের সমাজতত্ত্ব বিষয়টি অগাষ্ট কোঁত ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের নামের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এঁরাই 'সমাজতত্ত্ব' বিষয়টির উদ্ভাবক হিসাবে পরিচিত। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট—শিল্পবিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লব—এই দ্বৈত বিপ্লবের পটভূমি সমাজতত্ত্ব-এর উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু, সমাজতত্ত্বের নির্মাণকাল সুদীর্ঘ যদিও ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ফলে, সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সদর্থক, প্রগতিশীল ও গঠনমূলক চিন্তাভাবনা হয়নি একথা ঠিক নয়। অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তের মতে, বিজ্ঞান সম্মতভাবে সমাজের পঠন-পাঠন ও নির্মাণ সম্পর্কে পশ্চিম ইউরোপের এই আধিপত্য দীর্ঘদিন ধরেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে। বর্তমান সময়েও সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠনে এই ধারা অনুসৃত হয়ে চলেছে। ১৮৩৮ সালের আগেও তো সমাজ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা হতে পারে বা হয়েছিল যার দৃষ্টান্ত বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ গুরুত্ব দেইনি, পশ্চিমের উন্নতমানের ভাবনাচিন্তার প্রেক্ষিতে ঐসব

Scanned with CamScanner

ভাবনাচিন্তাকে আমল দেইনি। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার নতুন নতুন তথ্য ও সত্যের আলোকে অনেক পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীও এখন স্বীকার করেছেন য সমাজ সভ্যতার ইতিহাস শুধুমাত্র ইউরোপকেন্দ্রিক বলা যথাযথ নয় বস্তুত তা বহুকেন্দ্রিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পাশ্চাত্যে 'সমাজতত্ত্ব'-এর অনুষ্ঠানিক সূচনার মধ্যেই সমাজতত্ত্ব নির্মানের ইতিহাসকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে সঠিক কাজ হবে না। মনে রাখতে হবে, এর বহু যুগ আগে থেকেই এই পৃথিবীতে বহু সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটেছে। ভারতীয় সভ্যতা এর অন্যতম।

ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্ব চর্চার উদ্ভব বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। এই বিতর্কে বিভিন্ন পক্ষের যুক্তি প্রদর্শনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজতাত্ত্বিকদেরও অনেক ক্ষেত্রে এক পক্ষে দেখা যায়।

জিসবার্টের মতো বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, ভারতে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সর্বাধিক প্রাচীন উৎসগুলির দেখা মেলে ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে, বিশেষত উপনিষদ, সূত্র ও পুরাণগুলিতে। এ প্রসঙ্গে মনুসংহিতা, শুক্রাচার্য প্রণীত নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি ছাড়াও কৌটিল্য বিরচিত অর্থশাস্ত্রও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এইসব সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, সামাজিক প্রথা, লোকাচার, রীতিনীতি সংক্রান্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বের উন্মেষে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মনুসংহিতায় সামাজিক ধ্যানধারণা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদে আলোচনা রয়েছে। প্রাচীন ভারতের সমাজচিন্তা বিষয়ে আর একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল শুক্রাচার্য রচিত 'নীতিসার' নামক গ্রন্থটি। সমাজতাত্ত্বিক জিসবার্টের মতে, ভারতবর্ষে প্রাচীন ও তৎপরবর্তীকালের বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে প্রথমযুগের ঋষিদের অন্যতম শুক্রাচার্যের নাম করা যায় যিনি তাঁর 'নীতিসার' গ্রন্থে নীতিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্রের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারও এই গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় পড়ে বিস্মিত হন। তাঁরও মনে হয় যে এই গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ, প্রাচীন ভারতে হিন্দু সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা ও পার্থিব সভ্যতার বিশদ ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে এই গ্রন্থটির পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে তিনি এর ইংরেজি অনুবাদ শুরু করেন। ১৯১৪ সালে এই অনুবাদ গ্রন্থটি 'শুক্রনীতি' নামে প্রকাশ পায়। প্রথমদিকে বিনয় কুমার সরকার পাশ্চাত্যের ভারততত্ত্ববিদদের অনুসরণে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে জোরালো পার্থক্য করতেন। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশ্লেষণে বিশেষ করে শুক্রাচার্য রচিত

Scanned with CamScanner

গ্রন্থটি পাঠের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোনো মূলগত ও গুণগত পার্থক্যের কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। সমাজতাত্ত্বিক জিসবার্টের মতে, এক্ষেত্রে কৌটিল্য বা চাণক্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের বাস্তব ও তাত্ত্বিক অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও আইনের উপর সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ রচনা। কৌটিল্য রচিত এই গ্রন্থে শাসকের কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া আছে। প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রয়োজনে জনজীবনের বিভিন্ন দিকের বিশদ তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের আরও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চরকসংহিতায় চিকিৎসাশাস্ত্রের সামাজিক সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে বিশ্লেষণ করে দেখান হয়েছে। চিকিৎসকদের পেশাগত মূল্যবোধ, সামাজিক রীতিনীতি বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রচিত আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে এটি একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকে মুঘলদের সমকালীণ সামাজিক বিষয়াদির সাথে সাথে তৎকালীন হিন্দু আইন সম্পর্কেও অনেক বিষয় অবহিত হওয়া যায়। প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক বিনয় কুমার সরকার 'আইন-ই-আকবরী'কে 'মুঘল গেজেটিয়ার' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞানচর্চায় কিছুটা হলেও সমাজতাত্ত্বিক চেতনার অস্তিত্বের সমর্থকরা মনে করেন যে ভারতীয় সমাজে বহু প্রাচীন কাল থেকেই অভিজ্ঞতাবাদী ভাবনাচিন্তার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁদের মতে, সেই সময়কাল থেকেই এ দেশে সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ এবং নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাধারার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক একথা মানতে চান না যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার অস্তিত্ব ছিল। তাঁদের মতে, সেই সময় ভারতের বিদ্যাচর্চা ধর্মীয় ও দার্শনিক চেতনা দ্বারা যথেষ্টভাবে প্রভাবিত ছিল। সেই পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতাবাদী ধ্যানধারণা ভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক চর্চা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে, পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, একদিকে আধ্যাত্মবাদী, বাস্তবতাবিমুখ সনাতনী ভারতীয় মানসিকতা এবং অন্যদিকে প্রত্যক্ষবাদী, গবেষণা নির্ভর সমাজতত্ত্ব চর্চা পরস্পর বিপরীত।

এই পক্ষের সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার উদ্ভব ঘটেছিল ব্রিটিশদের হাত ধরে। ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনগত অনুসন্ধিৎসা এদেশে সমাজতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। ব্রিটিশ রাজপুরুষরা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন পরিচালনা করতে হলে

Scanned with CamScanner

এদেশে জমির মালিকানার ধরণ, আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা অবশ্য প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উত্তর ভারতে কর্মরত ইংরেজ প্রশাসক চার্লস মেটকাফ প্রাক ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সমাজ নিয়ে তথ্য ভিত্তিক কাজ করেছিলেন। এইচ. এস. মেইন, এলফিনস্টোন, ডেনজিল ইবেটসনের মত ইংরেজ প্রশাসকরাও এ বিষয়ে। তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন। কার্লমার্কস-এর মতে, ভারত বিষয়ে ইংরেজদের রচনায় ভূসম্পত্তির মালিকানার প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা যায়।

ব্রিটিশ শাসনকালে প্রকাশিত বুকানন, ব্যাডেন-পাওয়েল, রিস্‌লি, নেসফিল্ড হাটন, মেইন প্রভৃতির তথ্যানুসন্ধান ভিত্তিক রচনা ভারতে সমাজতত্ত্ব চর্চার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা যায়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসিয়াটিক সোসাইটি বা বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি বিভিন্ন গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের সূচনা ভারতবর্ষে সমাজতাত্ত্বিক চর্চাকে তরান্বিত করেছিল। এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারকরা সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ও লেখালেখির মাধ্যমে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার সূত্রপাত ঘটান। এ সময় থেকে একাধারে হান্টার, রিসলে, উইলিয়ম কেরী প্রমুখ প্রশাসক, সমাজ সংস্কারক ও সমাজচিন্তকদের গবেষণাধর্মী আলোচনা ও লেখালেখি আর অন্যদিকে প্যাট্রিক গেডেস, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, বিনয় কুমার সরকার, জি. এস. ঘুরে, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডি. পি. মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের বস্তুনিষ্ঠ সমাজ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ভারতবর্ষের বিদ্যাচর্চার একটি নবীন শাস্ত্র হিসাবে সমাজতত্ত্ব গড়ে উঠতে থাকে। এসবেরই পটভূমি হিসেবে ভারতবর্ষের নবজাগরণের প্রভাবের কথা কেউই অস্বীকার করেন না। অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত'র মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী দশকগুলি থেকে ভারতে বিদ্বৎজন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অনুমান মূলক ও বাস্তববাদী ধারণাগুলি পর্যায়ক্রমে এদেশে সমাজতত্ত্বের উদ্ভবে সহায়তা করেছিল (Sociology in India)।

অধ্যাপক এ. আর. দেশাই-এর মতে, ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলি ছিল ভারতীয় মানসে পাশ্চাত্যের উদার ধারণা বিস্তারেরই প্রকাশ। সামাজিক ক্ষেত্রে ছিল জাতব্যবস্থার সংস্কার, নারীর সমানাধিকার, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বিস্তার। যদিও, ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের অভিযোগ ছিল যে তৎকালীণ ভারতীয় সমাজে সমাজ সংস্কারের মন্থর গতির জন্য ব্রিটিশ সরকারের যথেষ্ঠ সমর্থনের অভাবই দায়ি। তবে একথা সত্যি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসকেরা দাসপ্রথা, সতীদাহ এবং শিশুবলি বন্ধ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট

Scanned with CamScanner

সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই সময় রাজা রামমোহন ও তাঁর পথ অনুসরণে ব্রতী সংস্কারকবৃন্দ ধর্ম, সমাজ ও জীবন দর্শনের প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটিয়ে ভারতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে দৃষ্টবাদি জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্সের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রকাশিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানকে ভিত্তি করে সমাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যভিত্তিক বিদ্যাচর্চার এক নতুন পরিসর সৃষ্টি হয়। এছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা, মুম্বাই (বোম্বে), মাদ্রাজ সহ ভারতের অনেক ছোট-বড় শহরে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণাধর্মী বিদ্যাচর্চার সংগঠনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই সংগঠনগুলির মধ্যে ডিরোজিওর নেতৃত্বে কলকাতার অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশান, সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ, লিটারারি সোসাইটি অব বোম্বে, বেথুন সোসাইটি, দ্য বেনারস ইনস্টিটিউট, আউধ সায়েন্টিফিক সোসাইটি অব লক্ষ্ণৌ, বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশান ইত্যাদি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনগুলির কর্মধারায় সমাজতাত্ত্বিক চর্চার বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজতত্ত্ব চর্চার উদ্ভবে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। অনেক সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন, ভারতবর্ষে 'নবজাগরণের' প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসমৃদ্ধ বহু বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক এবং এই সব আধুনিক সমাজ সংগঠন গুলির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে অনেকটাই সমাজ সচেতনতা গড়ে উঠেছিল এবং এই ইতিবাচক পরিস্থিতিই ভারতে সমাজতত্ত্ব-এর উদ্ভবের সহায়ক হয়ে ওঠে।

নবজাগরণের প্রভাব

ভারতে নবজাগরণের প্রভাব বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

হেস্টিংসের আমলে ভারতবিদ্যার প্রসারকে ডেভিড কপ রেনেশাঁস বা নবজাগরণের আগমণী বলে অভিহিত করেছেন। ব্রিটিশ ভারততত্ত্ববিদরা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন বলে কপ তাঁর মতপ্রকাশ করেছিলেন। "তিনি (কপ) মনে করেন, ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা ও তাদের ভারতীয় অনুগামীরা অন্ধ পশ্চিমীকরণ বা ভারতীয় সার্বজনীনতা ও পুরাতত্ত্বের গতিশীল জ্ঞানের কষ্ঠিপাথরে গ্রহণযোগ্য

Scanned with CamScanner

মূল্যবোধগুলিকে যাচাই করে সমকালীন ভারতে গ্রহণযোগ্য দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। "ভারতের নবজাগরণের প্রথম শুকতারা' রামমোহন রায় তাঁর সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনে ব্যবহৃত তীরগুলি প্রাচ্যবিদের তূণাধার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে।" (কেশব চৌধুরী, ১৯৮৪)

অধ্যাপক কেশবচৌধুরীর মতে, আরবী, পারসী বা সংস্কৃত ভাষায় লভ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি হেষ্টিংসের জাতিগত কোন বিরুদ্ধভাব ছিল না একথা সত্য, কিন্তু তিনি প্রাচ্যবিদ্যায় উৎসাহদানের নীতি গ্রহণ করে ভারতে রেণেশাসের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বলে প্রচলিত অভিমত অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট। হেস্টিংস বা ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়নি। ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা 'জনসাধারণের হিন্দুধর্ম' ও 'দার্শনিক হিন্দুধর্মের' মধ্যে পার্থক্য করতেন। প্রথমটিকে তাঁরা উপহাস করতেন আর দ্বিতীয়টিকে প্রশংসা করতেন। 'দার্শনিক হিন্দুধর্ম'কে প্রশংসা করার কারণ তাঁদের মতে এর অভিবিদ্যক ধ্যাণধারণা, দার্শনিকতা, নৈতিকতা খ্রীষ্টধর্মের বিরোধী নয়, বরং কাছাকাছি যায়।

অধ্যাপক কেশব চৌধুরীর মতে, প্রাচ্য তথা ভারতবিদ্যায় উৎসাহ প্রদর্শন কোম্পানির আমলে খুব অল্প সময় স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। হেস্টিংসের মত প্রশাসকরা প্রকৃত অর্থে ভারতীয় নবজাগরণ চাননি। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী শাসন ব্যবস্থা, আইন-কানুন প্রচলন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে সাধারণভাবে তাঁরা দেশীয় জনগণের আনুগত্য লাভের স্থায়ী বন্দোবস্ত করতেই অনেক বেশী উৎসাহী ছিলেন। ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা ঔপনিবেশিক মানসিকতার শিকার হয়ে ব্রিটিশদের শাসনকেই ভারতের জন্য আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে অভিমত প্রকাশ করেছেন, ভারতবাসীর পরাধীনতার সপক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন। অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, এ ধরণের মানসিকতার কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে একটি দেশ বা সমাজের প্রকৃত অর্থে নবজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করা খুব কঠিন বিষয়।

ভারতীয় সমাজতত্ত্বে ভারতবিদ্যার (ইন্ডোলজি) প্রভাব

ভারতীয় সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও তার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে দুটি বিষয়কে মূলতঃ ভিত্তি করা হয়—

১. ভারতবিদ্যা বা ইন্ডোলজির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। অথবা,

২. ভারতবিদ্যা বা ইন্ডোলজিকে গুরুত্ব না দেওয়া।

সামাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ভিত্তি হওয়া

Scanned with CamScanner

উচিত ভারতবিদ্যা বা ইন্ডোলজি। অধ্যাপক জি. এস. ঘুরে-র মতে, ইন্ডোলজি বা ভারতবিদ্যার সহায়তা ছাড়া ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক চর্চা ফলপ্রসু হবে না। ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির নিরিখেই ভারতীয় সমাজ ও সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ করতে হবে। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতির সুসম্বদ্ধ অনুশীলনের মাধ্যমেই এটা করা সম্ভব। প্রকৃত অর্থে ভারতে সমাজতত্ত্ব চর্চার সূচনা হবার আগেই ইন্ডোলজি বা ভারতবিদ্যার চর্চা এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই কারণে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের পতিকৃৎদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্যের ভারতবিদ বা ইন্ডোলজিস্টদের প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। প্রথমজীবনে প্রভাবিত হয়ে আবার অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকরের মত অনেক ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক পরবর্তী সময়ে ভারতবিদ্যা বা ইন্ডোলজির সীমাবদ্ধতার দিকটা বুঝতে পারেন। 'ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তুকেন্দ্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ অপর দিকে ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি জীবনের ধর্মীয় ও অধ্যাত্মিক বিষয়গুলি— এমন বক্তব্য যে অতি সরলীকরণ পরবর্তী সময়ে তা তিনি বুঝতে পারেন। বিশেষ করে, ১৯১০ সালে শুক্রাচার্যের 'নীতিসার' গ্রন্থটি পাঠ করে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বস্তুগত বিষয়গুলি অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণের পরিচয় পান। তিনি বুঝতে পারেন দৃষ্টবাদি, বস্তুনিষ্ঠ ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজেও অমিল ছিল না। এর নমুনা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমহলে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যেই বিনয়কুমার ১৯১৪ সালে 'নীতিসার' গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তৎকালীন ভারতীয় ব্যাখ্যাকারদের রচনায় শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ছিল একথা সত্যি নয়। সেই সময়কালের বিদ্যাচর্চায় যথেষ্ট পরিমানে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষবাদি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় এই কথা বিনয়কুমার সরকার তাঁর প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় তুলে ধরেছেন। এস. ভি. কেতকার বা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের রচনা ও বক্তব্যে ইন্ডোলজি বা ভারতবিদ্যার সপক্ষে সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁদের মতে, ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শাস্ত্র, পুঁথি, স্মৃতি ও সংহিতার সূত্র ধরেই ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুধাবন করা সম্ভব।

শ্রী আনন্দ কুমারস্বামী কিংবা ভগবান দাসের মত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমী সংস্কৃতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। ওঁদের মতে, ভারতীয় সমাজতত্ত্বের চর্চা পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তগুলির অন্ধ অনুকরণে কখনই সঠিকভাবে করা যাবে না। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবনের মাধ্যমেই তা করতে হবে। এভাবেই সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সামাজিক বিষয়গুলিকে বোঝা সম্ভব হবে।

Scanned with CamScanner

এ. কে. সারণও ভারতীয় সমাজচর্চায় পাশ্চাত্যের প্রভাবের সমালোচনা করেছেন। তার মতে, ভারতীয় সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ককে বুঝতে হলে ভারতীয় সমাজের মূল্যবোধগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে।

বর্তমানের অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক যাঁরা ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণ আগ্রহী, তাঁদের মতে শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে ভারতে সমাজতত্ত্ব চর্চা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের সমাজতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতের জাতি-বর্ণ, বিবাহ, পরিবার, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতানির্ভর অধ্যয়ন হয়েছে। কারো কারো মতে, এ থেকে প্রমাণিত হয় পাশ্চাত্যের সমাজতাত্ত্বিক চর্চার অভিজ্ঞতা ভারতীয় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রয়োগ করা সম্ভব। তবে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কিত ঐতিহ্যগত চিন্তাভাবনা সবটাই বর্জনীয় আর পাশ্চাত্যের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের সবই গ্রহণীয়— এমন ধরণাও সঠিক নয়। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক জি. এস. ঘুরে এক্ষেত্রে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনার সমন্বয়ের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাস্তবতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রয়োজন মাফিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতে সমাজতত্ত্ব চর্চার প্রকৃত পরিবেশ গড়ে ওঠা সম্ভব। তাঁর নেতৃত্বে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতীয় সাধুসমাজ, ধর্মচেতনা, জাতি-বর্ণ, উপজাতি, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাধর্মী কাজে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব চর্চা প্রকৃত অর্থে ভারতে এই সময়ই শুরু হয়।

স্বতন্ত্র শিক্ষাগত বিষয় হিসেবে ভারতে সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন

স্বতন্ত্র শিক্ষাগত বিষয় হিসেবে সমাজতত্ত্ব ১৯১৯ সালে প্রথম মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়। বিশিষ্ট ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক এবং নগর পরিকল্পনাবিদ প্যাট্রিক গেডেস এই বিভাগের প্রথম অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। গত নয় দশকেরও বেশি সময় ধরে এই বিভাগ ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ায় সমাজতত্ত্ব বিষয়ের পঠনপাঠন এবং গবেষণার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই সময়কালে এই বিভাগ থেকে দুশো পঞ্চাশেরও বেশি পি.এইচ.ডি এবং এম.ফিলের গবেষণাসন্দর্ভ প্রকাশিত হয়েছে। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অনেক বিশিষ্ট প্রাক্তনী পরবর্তীকালে সারা ভারতজুড়ে সমাজতত্ত্বের পঠনপাঠন ও গবেষণার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা এক্ষেত্রে এম. এন. শ্রীনিবাস (এম.এ ১৯৩৮, পি.এইচ.ডি. ১৯৪৩) , উরাবতী কার্ভে (এম. এ. ১৯২৮), আই. পি. দেশাই (পি.এইচ.ডি. ১৯৪৩), ঔয়াই.

Scanned with CamScanner

বি. ডামলে (পি.এইচ.ডি. ১৯৫০), ভিলাস মনগাভে (পি.এইচ.ডি. ১৯৫০), এম. এস. এ. রাও (পি.এইচ.ডি. ১৯৫৩), প্রভৃতি বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিকদের নাম উল্লেখ করতে পারি। অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডেস ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সাল অবধি বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। সমাজতত্ত্বের ছাত্রদের তিনি সবসময় ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং ক্ষেত্র গবেষণার গুরুত্বের কথা বোঝাতে চেষ্টা করতেন। অধ্যাপক জি. এস. ঘুরে ১৯২৪ সালে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৫৯ সালে অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এই পদেই ছিলেন। অধ্যাপক ঘুরের প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ ছিল সংস্কৃত এবং ইন্ডোলজিতে। পরবর্তীকালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক ডালু এইচ. আর. রিভার্সের নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে গবেষণাধর্মী কাজে যুক্ত হন। ইন্ডোলজি এবং নৃতত্ত্বর এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাজে এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। তাঁর অবসরের পর তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রফেসর এমেরিটস হিসেবে যুক্ত হন। অধ্যাপক ঘুরের কাছে গবেষণা করে ৫৫ জন ছাত্র সমাজতত্ত্বে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। খুব সম্ভবত কোনো একজন সুপারভাইজারের নির্দেশনায় গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের এই সংখ্যাটাই ভারতে সবচেয়ে বেশি। ইরাবতী কার্ভে, ওয়াই. বি. ডামলে, এম. এন. শ্রীনিবাস, এম. এস. এ রাও, এ. আর. দেশাই, ডি. নারাইন, আই. পি. দেশাই, এম. এস গোরে, সুমা চিটনিস, ভিকটর ডিসুজা— এই সব ভারত বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিকরা অধ্যাপক ঘুরের কাছেই প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। কে. এম. কাপাডিয়া অধ্যাপক ঘুরের পর ১৯৬০ সালে এই বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে তাঁর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুতে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ জীবনের অবসান হয়। সমাজতত্ত্বের কোন পড়ুয়া তাঁর 'ফ্যামিলি অ্যান্ড ম্যারেজ ইন ইন্ডিয়া' বইটির কথা ভুলতে পারবে না। ১৯৬৭ সালে এই বিভাগের প্রধান হন অধ্যাপক এ. আর. দেশাই। অধ্যাপক দেশাই-এর সোস্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিসম্, রুরাল সোসিওলজি ইন ইন্ডিয়া' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি ভারবর্ষের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত। ইন্ডিয়ান সোসিওলজিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় এবং সোসাইটির জার্নাল সোসিওলজিকাল বুলেটিন প্রকাশে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের নেতৃত্বের কথা কেউই অস্বীকার করেন না। ইন্ডিয়ান সোসিওলজিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার শুরুতেই, ১৯৫২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক জি. এস. ঘুরে এর সভাপতির পদ অলংকৃত করেন এবং অধ্যাপক কে. এম. কাপাডিয়া ও অধ্যাপক জে. বি. ফেরেইরা ছিলেন এর সম্পাদক।

এরপরই লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের কথা উল্লেখ করতে হয়।

Scanned with CamScanner

ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্ব চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। ১৯২১ সালে রাধাকমল মুখার্জির নেতৃত্বে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের একটি যুগ্ম বিভাগের সূচনা হয়। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের এক সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এই বিভাগ তার গবেষণাধর্মী কাজ শুরু করে। অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জি অঞ্চলকে একটি বাস্তব সত্য ধরে নিয়ে গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিতেন। এর একবছর পরে অধ্যাপক ধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ১৯২৮ সালে অধ্যাপক ডি. এন. মজুমদার এই বিভাগে যোগ দেওয়ায় লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের পঠন-পাঠন এবং গবেষণার কাজ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়।

দক্ষিণ ভারতে মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৯ সালে সমাজতত্ত্ব বিভাগ শুরু হয় একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে। যদিও ১৯২৮ সাল থেকে স্নাতক স্তরে সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠন চালু ছিল। এর তিনবছর আগে ১৯৪৬ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে সমাজতত্ত্ব বিভাগ কাজ শুরু করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়েও ১৯২৮ সালে স্নাতক পর্যায়ে অন্যতম ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্ব চালু করা হয়।

পুনের ডেকান কলেজ ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যায়নের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ইরাবতী কার্ভে ১৯৩৯ সালে এখানে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও পাঠদান শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে পুনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে এই সমাজতত্ত্ব বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭৩ সালে এই বিভাগ ডেকান কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়। ইরাবতী কার্ভে এথনোগ্রাফি এবং নৃতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেন। ভারততাত্ত্বিক বা ইন্ডোলজিকাল পদ্ধতি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসারী ক্ষেত্র গবেষণা এই দুয়ের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর গবেষণার কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে আই. পি. দেশাই এবং ওয়াই, বি. ডামলে এই বিভাগে যোগ দিলে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার নতুন নতুন পদ্ধতি ও বিষয় এই বিভাগের সমাজতত্ত্ব চর্চায় যুক্ত হয়। এরপর ১৯৭৯ সালে বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ডি. এন. ধানাগারে এই বিভাগে যোগ দেন। এর ফলে, প্রতিবাদ আন্দোলন, কৃষিগত পরিবর্তন, মার্কসীয় পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে এখানে শিক্ষাদান এবং গবেষণার কাজ শুরু হয়। এছাড়াও আর. এন. কুলহাল্লি ধর্মের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে, ইউ. বি. ভোইতে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব বিষয়ে এবং এ. রামাণাম্মা শিল্প সমাজতত্ত্ব, মেডিক্যাল সমাজতত্ত্ব ও উইমেন স্টাডিজ বিষয়গুলিতে শিক্ষাদান ও গবেষণাধর্মী কাজ শুরু করেন।

ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসে বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও

Scanned with CamScanner

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ অনেক পুরনো এবং উল্লেখযোগ্য নাম। ১৯৫১ সালের জুন মাসে বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস বিভাগীয় প্রধান হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিভাগের সূচনা করেন। ১৯৫৯ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগে আট বছর এই বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিকের পরিচালনায় বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে সমাজতত্ত্ব চর্চার জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠনে ক্ষেত্রগবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে প্রথম থেকেই সমাজতত্ত্ব চর্চার জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠনে ক্ষেত্রগবেষণাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এরফলে ছাত্রদের মধ্যে প্রথম থেকেই সমাজতত্ত্ব চর্চায় ক্ষেত্রগবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা তৈরি হতে থাকে। হাতে-কলমে কাজ করে এর প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে ছাত্ররা অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে থাকে।

ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করতেই হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত ১৯৫৯ সালে দিল্লি স্কুল অব ইকনমিকসের সাহচর্যে। অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস এই বছরেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। শুরুতে এই বিভাগে এম. এ. এবং পিএইচ. ডি কোর্সই করানো হতো। ১৯৬৬ থেকে দু-বছরের এম. লিট ডিগ্রি চালু করা হয়। ১৯৭৬ থেকে এম. লিট-এ পরিবর্তে এক বছরের এম. ফিল কোর্স চালু করা হয়। ১৯৬৮ সালেই ইউ. জি. সি এই বিভাগকে সমাজতত্ত্বে সেন্টার অব অ্যাডভান্স স্টাডি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এছাড়াও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ASHISS (Assistance for Strengthening of the Infrastructure of the Humanities and Social Sciences) ইউ. জি. সি থেকে অনুদান পায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে বর্তমানে আটজন প্রফেসর, আটজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং দু'জন অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর কর্মরত। এছাড়া বহু গবেষণা সহায়ক এই বিভাগের বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত রয়েছেন। বিভাগীয় বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার জন্য এগারো জন স্থায়ী শিক্ষাকর্মী এই বিভাগের সাথে যুক্ত। নতুন নতুন বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার কাজে এই বিভাগ সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কম্যুনিটি পাওয়ার স্ট্রাকচারস, লোকাল-লেভেল পলিটিক্স, ট্রেড ইউনিয়নস, কো-অপারেটিভস, টেক্সচুয়াল অ্যান্ড কনটেক্সচুয়াল স্টাডিজ অব হিন্দুইজম, রিলিজিয়াস সিম্বলিসম, ফ্যামিলি অ্যান্ড কিনসিপ, সোস্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস মুভমেন্টস, সোসিওলজি অব ম্যাসকুলনিটি, ডেমোগ্রাফী, পপুলার কালচার, মাইগ্রেশন, এডুকেশন, সোসিওলজি অব ভায়োলেন্স, জেন্ডার.

Scanned with CamScanner

এনভায়রনমেন্ট, সোসিওলজি অব ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে পড়াশুনো এবং গবেষণার কাজ চলছে।

ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব চর্চায় একটি অগ্রণী নাম নয়া দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক যোগেন্দ্র সিং এবং অধ্যাপক টি. কে. উমেন-এর মতো বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক বর্তমানে এমেরিটাস প্রফেসর হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দ্য সেন্টার ফর দি স্টাডি অব সোশাল সিস্টেমে' সমাজতাত্ত্বিক পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজে যুক্ত আছেন প্রফেসর আনন্দকুমার, প্রফেসার অভিজিত পাঠক, প্রফেসর মৈত্রেয়ী চৌধুরী, প্রফেসর ভি সুজাথা, প্রফেসর সঞ্জয় শ্রীবাস্তব-এর মতো সমাজতাত্ত্বিকরা। জে. এন. ইউ-এর এই সেন্টারে কুড়ি জন অধ্যাপক প্রোফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন। এই বিভাগে পঠন-পাঠন ও গবেষণাক্ষেত্রে 'স্টাডি অব সোশাল সিস্টেমস, সোসিওলজি অব নলেজ, সোসিওলজি অব প্রফেসন, সোশাল সাইকোলজি, সোশাল অ্যানথ্রোপলজি, জেন্ডার, গ্লোবালাইজেসন, কালচারাল স্টাডিজ, ইন্ডিয়ান সোশাল থট, এথনিক মাইনরিটিস, মার্জিনাল সোশাল গ্রুপস, সোশাল ইকোলজি, সোশাল ডেমোগ্রাফি, সোসিওলজি অব সায়েন্স / মেডিসিন, ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। ২০০০ সাল থেকে দু' শতাধিক ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে এই বিভাগ থেকে পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন।

জে. এন. ইউ-তে ১৯৭০ সালে স্থাপিত স্কুল অব সোশাল সায়েন্স-এর অন্তর্গত বারোটি সেন্টার আছে। 'সেন্টার ফর দি স্টাডি অব সোশাল সিস্টেম' এরই অন্তর্গত। এই কেন্দ্রগুলির গবেষণা কাজে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারী দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

Scanned with CamScanner